Q. ৪১. সংক্ষিপ্ত

'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

"গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব ব্যবধান।"

— কবিতা আলোচনায় বিস্তারিত পরিচিতি দাও

নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যে ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণের কথা বলা হয়েছে তা মূলত বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার ব্যাপকতাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু 'সর্বহারার' গ্রন্থের কবিতা সম্পর্কে শ্রেণী চেতনা স্পষ্ট। কবি এখানে কৃষক, শ্রমিক, ধীবর প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য গান রচনা করেছেন। সাম্যবাদীর মানবী চেতনা সর্বহারাতে সংক্রমিত শ্রেণীচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও নজরুলের উপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব বা প্রয়োগ বলা সাম্যবাদী পদাবলীর কবিতা সম্পর্কে লক্ষ্য করা গেলেও রাজনৈতিক তত্ত্ব রূপে মার্কসীয় মতাদর্শ কমিউনিজম তাঁর কবিতায় আখ্যাত হয়নি বরং তা বর্জিত। এই প্রসঙ্গে সমালোচক সুশীল কুমার গুপ্ত লিখেছেন—

"নজরুলের সাম্যবাদ তাঁর অন্তরেরই প্রেরণা লব্ধ জীবনের ও কবিতার ভাব লোকের মধ্যে গঠিত, বাহ্য ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য কেবল এই সাম্যবাদের ভিত্তি।"
নজরুলের সাম্য সম্পর্কে মানবিক দুর্বলতা ও প্রচুর এবং, সেই সঙ্গে এই দুর্বলতা যে ভাব ও নব সমাজ গঠনের ইঙ্গিত ও পরিস্ফুট।"

আলোচ্য সাম্যবাদী কবিতায় সাম্যের মন্ত্রে কবি সকলকে অনুপ্রাণিত হতে বলেছেন। সাম্যের গানে উদ্বোধিত মানুষ শতাব্দীর ঘুমের এ দুর্দিপাত করে তাহলে দেখতে পাব যে, মানুষের মধ্যে যতই ধর্ম ও অন্যান্য বিভেদের প্রাচীর তোলা হোক না কেন প্রকৃত অর্থে তিনি কেবলই সন্তান মানুষই এক। কবিতাটির মূল বক্তব্য প্রকাশ করে কবিতায় বলেছেন—

"তোমাতে রয়েছে সকল দেবতা, সকল দেবের গান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাব আজ, খুলে দেব যত প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-বিধি হবে সকলের দেবতার।"

বোঝা যায় দেশ, কাল, পাত্রের ভেদাভেদকে অস্বীকার করে তিনি ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিত প্রাণের জয়গান গেয়েছেন। ধর্মের গোঁড়ামি ও শাস্ত্র বিধানের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর উপলব্ধি জাত চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'সাম্যবাদী' কবিতায়। মনে হয়, আলোচ্য কবিতার মূল প্রেরণায় আছে সমকালীন জীবন-ভাবনা সমাজের ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা, শাস্ত্রবাদের সর্বস্বতা, জাতিভেদ, ধর্ম বিরোধ আর অন্যান্য প্রেরণায় বিভিন্ন দেশলোক

Shot on realme 3i
Scanned with CamScanner

[illegible] চেতনার আধুনিকতা। কবি সঞ্চয় বলেন—

"হৃদয়ের গভীর অমৃত গহ্বর নিভৃত অন্তরালে।"

— তখনকার চেতনা অপেক্ষায় ছিল যে অন্তর্মুখী রহস্যের গভীরতা যেন মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এখন সেই জীবনের বিকাশ সন্ধানে দেহ ভাবে মন — বৃন্দাবনেই সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথাবদ্ধ আচার ধর্মীয় প্রতি সংগত অবিশ্বাস নজরুলকে উগ্র করে তোলে 'মন্দির-কাবা'র প্রতি।

"এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন আর মন্দির কাবা নাই।"

এই হল কবির সাধনা — শাস্ত্র, পুঁথি, মন্দির, গীর্জা অতিক্রম করা পরম তত্ত্বের সাধনা। একেশ্বরবাদ, দ্বৈত দ্রষ্টিতা, শাস্ত্র দ্রষ্টিতা নেই — যা আছে তা হল অন্তরের মানবিক অন্তরেই অনুসন্ধান। ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা নজরুলের আলোচ্য কবিতায় কাজ। তিনি যাই এত থেকে ধীরে ধীরে অন্তর প্রদেশ অনুসন্ধানে যাত্রা করেছেন। নজরুল যাইহোক ধর্মীয় উদ্দিপনা মূলক কবিতা রচনা করেছেন তাও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হয়ে সঙ্গীত সৌন্দর্য সাধনার পথে প্রকাশ করেছেন এমন ইঙ্গিত বোধ হয় সমালোচ্য কবিতার কবির রচনার বিচিত্র

নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতায় মানব প্রেমের যে ঝঙ্কার উচ্চারিত — কবির সাধনার যে দর্শন অন্তর্দৃষ্টিকোণে প্রকাশিত সেখানে ক্রিয়াশীল পরোক্ষ তাঁর সুতীব্র জীবনবোধ ও জীবনের প্রতি আসক্তি, তাই সমস্ত পূর্বের ধর্মীয় সকল সংকীর্ণতার বিরোধ তাঁর কবি কাব্যের মাধ্যমে সচল হয়ে উঠেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে নজরুলের ধর্ম দ্রষ্টিতা গৌণ হয় তা প্রকৃত পক্ষে হল মানব প্রেমিক কবি কবির তীব্র জীবনাসক্তি। নির্বিশেষ ঈশ্বর চেতনাকে 'সাম্যবাদী' কবিতায় পরিত্যাগ করতে পারেন — মানুষের মধ্যে সমস্ত ধর্ম ও ক্ষেত্রে পুরোহিতের আছে, সুতরাং প্রথাবদ্ধ শাস্ত্রের আচার সর্বস্বতাকে জীবন দৃঢ় মনে করে হৃদয়ের গভীর অমৃত গহ্বরের নিভৃত অন্তরালে যে পরমের নিত্য ও অখণ্ড বিরাজিত তাকে — কোনো মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা, ত্রিপদকে আশ্রয় করে মুক্তির নামান্তর মাত্র। হৃদয়ের কোন সুগভীর অন্তরে দ্বারা ও হয়। আসলে নজরুল তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের আলোকে পরিস্নাত হতে চেয়েছিলেন। মানব ধর্ম ও মুক্তির সম্বন্ধ যদি হয় তাহলে মানুষ ~~মানুষ~~ মুক্তির পরিবর্তে উগ্র হয়। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন কে দৃঢ় মনে করে তিনি তাঁর নজরুল কে তাদের প্রতিনিধি হয়েছিলেন — ধর্মীয় প্রেরণায় হিন্দু মুসলমানের সংহতি ও মিলন ধর্ম আধুনিক সমাজ — চেতনার অবান্তরিত করে উদ্দেশ্যেই তাঁর কাছে ঈশ্বর সাধনা মূলক চেতনার

নতুন ভাবনা — যাকে উত্তম বলে তাই শ্রেয়নাড় আছে। সংসারলীলার সমাজ, ধর্মব্যবস্থার ও তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তর শ্রেয়নাড় আছে কবির স্বদেশের মধ্যবিত্ত সাধারণের অন্তর্গত অন্তর্লীন ঈশ্বর; তাই তিনি বলতে পারেন—

"পাঠাই সামান্য গান—
যখানে আসিয়া হয় সব ব্যথা অবসান"

---

২. 42.
দারিদ্র্য কবিতায় দারিদ্র্যের দুর্বিষহ রূপ কিভাবে কবিকল্পনার মাধ্যমে আভিষিক্ত হয়েছে আলোচনা করো

কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনায় কবির ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্ত অপরিহার্য কিনা সে বিতর্ক আজও অমীমাংসিত। তবুও কবির ব্যক্তিগত জীবন; জীবনাদর্শ তথা কবির বিশিষ্ট মানসিক সংগঠনের আংশিক প্রতিফলন যেন কোনো কবিতায় অনিবার্য মত রূপে লাভ করে সামান্য সন্দেহ নাই কাব্য কবিতা কবির একান্ত ব্যক্তি জীবনের বোঝা নয়— ব্যক্তিগত অনুভবনা কে সংধারণ সার্বজনীনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময় তার স্তরে উন্নীত হতে হয় কবিতার কথা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ সেকারণেই বলেছিলেন যে, কবিতার বিষয় কিছু নাই হোক না কেন, তাকে প্রথমত; এবং শেষত: হয়ে উঠতে হবে কবিতা। সিন্ধু হিন্দোল কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দারিদ্র্য' কবিতাটির আলোচনায় যদি নজরুলের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টানি তাহলে অবশ্যই, সেই প্রসঙ্গের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই স্বীকার্য। নজরুলের বাল্যকাল হীন ছিল দুঃসহ দারিদ্র্য ক্লিষ্ট। দারিদ্র্য তার জর্জরিত এই ব্যক্তিত্বের বিকাশেই ঘটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে চিরন্তন বোঝা দারিদ্র্য কাছে ভয়ের ছিলেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অপরাজেয় রূপে দারিদ্র্যকে তিনি বরণ করেছিলেন জীবনের শেষ প্রহর।

ছাড়িয়ে অগ্রসর উত্তরণের বা দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীতে মানুষের প্রয়াস নেই দিক থেকে তিনি খাঁটি আধুনিক কবি এবং আধুনিক কবিতার সূত্রপাতে তাঁর ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য কারণ তিনি বাংলা কবিতাকে এক অনমনীয়তা ও বক্তব্য থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও রবীন্দ্র বিরোধীতায় তাকে আজীবন ভাবে অতীর্ণ হতে হয় এবং তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্বই তাকে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র পথ পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। পলাতকা ও জীবনবন্দনা 5th Paper পাঠ্যে আছে।

* বুদ্ধদেব ইলানীং পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যসাহিত্যের নারীকেন্দ্রিক সমস্ত কবিতা থেকে নজরুলের "নারী" কবিতাটির মৌলিক পার্থক্য আছে —— আলোচনা কর।

উঃ নজরুলের কাব্য সাহিত্যের প্রথমদিকে অক্ষয়কুমার বড়াল মুগ্ধ পত্নী প্রেমকে অবলম্বন করে নিরুত্তর প্রেম ও সৌন্দর্যে বেদনা আহরণ করেছিলেন তাঁর কাছে নারী ছিল দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাছে নারী ভোগের উপাদান — রূপ সচেতনতা নিয়েই তার নারী প্রেম। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারী সৌন্দর্যে বিহ্বল ছিলেন বটে কিন্তু প্রকৃতির দৃষ্টিতে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল সান্ধ্যবাদী, মুকুল, বারাঙ্গনা প্রভৃতি কবিতায় আলোচ্য সানেট মানুষের জীবনের দুঃখ বলে যে কথা বলা হয়েছে 'নারী' কবিতায় তে তারই অনুরূপ প্রকাশ দেখা যায় আসলে সংহারা কল্পনাতে সান্ধ্যবাদী কবিতা গুলির অন্যতম আলোচ্য কবিতায় নারী জাতির প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপিত হয়েছে।

□ আলোচ্য কবিতায় কবির যে সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় — আমরা সাধারণত সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পণ্যরূপে ভাবি করে এসেছি প্রাচীনকাল থেকে নারী ভোগবাদের নিতি দীক্ষিত হয়ে এসেছে। আধুনিক যুগেও মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সমাজে নারীর স্থান

ও ভূমিকা নির্ধারিত কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে বঙ্গীয় সাহিত্য আধুনিকতার বোধের যে ইন্দ্রধনুর ছটা তারই সমন্বিত আলেখ্য নারী কবিতাটি সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র নারীর সমস্ত অধিকার দানের যে প্রয়াস বঙ্গদর্শন আলোচ্য কবিতাতে উচ্চারিত পাওয়া যায় তা প্রকৃত অর্থেই দুর্লভ তাই এই সময় আমাদের জীবনদর্শন বিচারিত। বঙ্গদর্শন উপলব্ধি করেছিল, বিশ্বের উন্নত সমাজ নারী নির্মল, পবিত্রতার, সম্মানের, নির্যাতন, অত্যাচার ও অবহেলার প্রশ্নে স্বীকার — অনুন্নত অবস্থায় নারী, যা সমগ্র সমাজ বিচ্যুত হয়ে চির অচলা জীবনযাপন করে, দুঃখের মধ্যে নারী যেন নিছক, চলেছে সিঁদুর, সমাজের মধ্যে সমস্ত নারীকে কেন্দ্র করে কবির যেন কবিমন আবর্তিত প্রেম ও সৌন্দর্য বর্ণনার কে স্বীকার করে তার সুখ দুঃখ সংবেদনা, অভিলাষ, চেতনা বোধ ইত্যাদি সমাজ রক্ষণশীলতার উদাসীন থাকে, বঙ্গদর্শন এর সাথে বিরোধী হয়ে আলোচ্য কবিতায় নারীর সমান অধিকারের প্রশ্নটিকে বড় করে তুলেছে।

সাম্যবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কবিতায় নারীর দুঃখের কোনো অবসান নেই কেননা বিশ্বে আজ পর্যন্ত সব সময়ে সুখী বা বিত্ত বাসনার ও সংসারের তাড়নার শুধু এরা দুঃখের বই নারীজন্ম উদ্ভব হয়নি বিরচিত। কিন্তু অবলাবিত ও লাঞ্ছিত হতে হয় নারীকে শুধু তার বিশ্বে সর্বসময় উচ্চ প্রেরণায়, নারী আজও তাদের দুঃখ প্রেম সংবেদনে লালিত সংসারকে সুন্দর ও সুন্দর করে তোলে তাদের সংসারে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা হতে পরিবর্তন হয় সেখানে দুঃখ আত্মকেন্দ্রিক সংগীত, ভাবনা, লোকায়ত সেখানে নারী সকল প্রকার লোক সংগীতের উদ্দেশ্য আলোচনা করার স্মৃতি দুঃখমাখা বেদনাকে।

তবে নারী সৃষ্টি ও সংরক্ষণশীল গৃহকর্ত্রী শুধু নয় যে আবেগের সৃষ্টিও নয়। বিশ্বসৃষ্টি পিছনে নারী দায়ী করতে হয় — এ বিশ্বে যত সৃষ্টিকারে দুঃখে, বিশ্বাদে মধ্যে, নারী দিল তার দুঃখ, যা, শুধু সদা সুখ বিশ্বাস

সমাজে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে নারী যে পুরুষের সাথে সমান অংশীদার, সমাজ-বিকাশের ধারায় কোনো অংশে কম নয়।

শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে নারীর দান সুমহান -

"নারীর শিরোপে নারী শিল্পের নব বেশে কবিতা প্রাণ
মত কথা তার — হইল কবিতা সফল হইল গান"

□ কোনো কালে এবং পুরুষের ভয়াবহ রোষানলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করেছে, শক্তি দান করেছে কিংবা লক্ষ্মী নারী তথা দুর্গারূপে পুরুষ তাদের আদর্শ জীবনের সঙ্গিনী যুগে যুগে নারী মহামানবশক্তি জন্মদান করেছে। পুরুষের দীপ্ত নয়নে শান্তশ্লিগ্ধতার অবতরণ করেছে নারী, শিশুকে দয়ামায়া স্নেহে ভরে প্রেমে মমতা করে তোলে নারী কবির দৃষ্টিতে তাই নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের সভ্যতাবুদ্ধিতে উভয়ের ভূমিকা সমান স্বাভাবিক কবির নারীর অধিকার দাবী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে —

— "দেবতার মূল, মানুষের মূল, সাম্যের মূল আজি
কেহ রুখিবে না বন্দি কারাগুরুভীতিরে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্করী,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দি, তবে এ নরমুণ্ডে
আপনারই রচা ওই কারাগার ধ্বংস করিতে ভুলে!"

অতএব নারীকে পিষ্ট করার অর্থ অর্থ নর ও পুরুষ যে ক্রমে শ্রীতে পরিণত হবে এই সত্য উপলব্ধি করার দিন এসেছে কেননা পুরুষ ধর্ম এই —

পীড়ন করিলে সেই পীড়ন এসে পীড়ে তোমাকে

□ নজরুল ইসলাম অন্যত্র নারী অবাধিকার মুক্তি কামনা করেছেন — আহ্বান জানালেন নারীকে স্বর্ণ লৌহ অলঙ্কারের মধ্যযুগীয় বন্দিনী দশা থেকে নারী প্রথম অবরোধ ভেঙে মুক্ত হতে বলেছেন

— "যে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভিরু, উড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!"

রফিকুল ইসলাম সাহেব যথার্থই জানিয়েছেন "নজরুলের নারী কবিতায় নারী জাগরণের যে প্রমাণ তা আমাদের নারী জাগরণে

মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা থেকে আধুনিক মুক্তিকামী মানুষের জীবনে উত্তরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য।" আজকে কবির চিন্তায় ছিল

~~উপমা ১~~

তে-দিন সুদূর নয় —
যেদিন উত্তরী পুরুষের সাথে নারীও এসে।"

II সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের শুরু হয়েছে সাম্যবাদীর অভ্যর্থনা বিরোধী প্রতিবাদ দিয়ে। কেন্দ্রীয় সুরের প্রতিধ্বনি ঘটেছে সাম্যবাদী কবিতাটির মধ্যে যেখানে কবির দৃষ্টি পিতৃতন্ত্রের অন্যায় দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতি সচেতন ভাবে আঘাত করেছেন। হয়তো তার কিছু অংশে প্রচার ধর্মী হয়ে উঠেছে, আঘাতের দ্বারা জাগরণ আনার জন্য কবি নারীর নিজের দিকে দৃষ্টি প্রদান অন্তত হয়নি তবু সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে 'নারী' কবিতাটি উজ্জ্বল বলেই নারী স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী রূপে এর সার্থকতা, অত্যাচার অবিচার বৈষম্যের বিরুদ্ধে কে যেন অভিযোগের অনল প্রজ্বলনা ~~অনুভব~~

* সাম্যবাদী কবিতার অংশ 'ঈশ্বর' এ বজরুল প্রচলিত সমাজ ও ধর্মীয়রূপের বাইরে আপন অন্তর্ধর্মে ও সাম্যকে অন্তর-অনুভব করেছেন —— আলোচনা কর।

উঃ অর্থাৎ কাব্যগ্রন্থে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা সাম্যবাদী প্রকাশিত হয়েছিল শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'লাঙল' এ ১৯২৫ এর ২৩ শে ডিসেম্বর। কবিতাটির বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দান করলে দেখা যায় যে শ্রেণীচেতনা মুক্তির কোনো চিহ্ন এখানে স্থান পায়নি ঈশ্বর ও ধর্মকে নাকচ করার কোনো প্রয়াস ও এখানে নেই বরং কারণ সবিনয়ে মাত্র মানবধর্মের সম্মানের প্রাধান্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়, এখানে মানুষের যে দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে তা মূলত ধর্মীয় ব্যক্তিগত মানুষের হৃদয়কে কেন্দ্র করেই, কেন্দ্র তীর্থস্থান এবং সাধারণ সাধনার মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে, যা বাংলার মরমী ঐতিহ্যের অনুসৃতি মাত্র। কিন্তু সমালোচক যেভাবে

Q.10. রবীন্দ্র কবি জীবনে জীবন দেবতা স্বরূপ 'জীবন দেবতা' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর কবির সৌন্দর্য অন্বেষণ ও উপভোগ তবু এখানে রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের একটি অন্য সঞ্চরণ ও স্বতন্ত্র রূপের সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত সাধনা প্রচেষ্টার মূল শক্তির উৎস রূপে, জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী পরিচালক রূপে জীবন দেবতার এই বিচিত্র রহস্যময় অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব। পৃথিবীর অন্য কোন কবির মধ্যে এই এই বিশিষ্ট প্রত্যয়ের অনুভূতি ও কাব্যে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ বোধ হয় আর দেখা যায় না। কবির মধ্যে শক্তি যে আলোচনা অনুপ্রেরণার জন্য একথা অনেকেই বলেছেন কিন্তু এটাই হয়ত যে সুখ দুঃখ, ভাব চিন্তার ধর্ম সুস্থ শক্ত প্রবৃত্তি হইলো পরম জন্মান্তর ব্যেপে জীবন চেতনার পরিচালনা করেছে। এরূপ প্রত্যয় অনুভূতি কোন দেশের কোন কবির কাব্য কাব্যকারে প্রকাশিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদেবতাবাদ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে— সমালোচকেরা একমাত্র প্রত্যয়ে নন। আবার কেউ স্বয়ং একাধিক বার এর অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়েছেন। তবে কবির এই জীবন দেবতার স্বরূপ তিনি কয়েকটি কবিতা অবলম্বনে সবথেকে বেশি পরিচয় করেছে। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্যামী কবিতাতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবে নিজের জীবনে এ মহাশক্তির লীলার কথা প্রকাশ করেন — যেটির অন্তরে হাসিনী মহাশক্তি যেভাবে নিয়ে এক অপূর্ব কৌতুক করছেন। যখন তিনি সাহিত্য রচনা করেন তখন মনে করেন তিনিই তাঁর রচিত সাহিত্যের স্রষ্টা, রচনায় তিনিই সার্থকতা বিধানকর্তা, অনুভূতি প্রকাশ করেছেন কিন্তু পরক্ষণেই অনুভব করেন তার লেখার মধ্যে এমন সুর ধ্বনিত হচ্ছে যা তার আয়ত্তের বস্তুকে অতিক্রম করে বিশেষ হয়ে পারছে। কবি চিত্তের নিয়ামক সেই অন্তর্যামীকে বলেছেন —

"তোমার মুখের পানে চাহিনু অমনি
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লহ তুমি কথা কহ
মিশাইয়া আপন সুরে।"

তার কেবল আপন কাজের প্রকৃত অর্থ কেউ জানেন না। আর এ কোন অন্তর্যামী জীবন দেবতা হয়েছেন —

"কে কেমনে বোঝে তার অর্থ তাহার
কেহ ভাল বলে কেহ মন্দ বলে তারে

আমার সুখই বৃথা বারবার
দেখে তুমি হাস তুমি!"

কবির ব্যক্তিগত জীবনও এই অন্তর্যামী জীবন দেবতার অসীম প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তবু সৃষ্টিতেই যে কবির সার্থকতা সেই সৃষ্টির সমস্ত অনুপ্রেরণা এই জীবন দেবতার কাছে আসছে বলে কবি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন—

"চিরদিবসের মর্মের ব্যথা
শত জনমের নীরব সফলতা
আমার প্রেয়সী আমার দেবতা
আমার বিশ্বরূপী।"

কবির ব্যক্তিজীবনের মধ্যে জীবন দেবতার যে লীলা চলেছে সেই লীলায় ব্যক্তি জীবনের শত সংগীতময়তা, অভিজ্ঞতা, স্খলন-পতন ত্রুটি কী ভাবে দূর করে জীবন দেবতা তাকে পরিপূর্ণ বিশ্ব জীবনের প্রতিচ্ছবি নিয়ে আত্ম গোপন করেছেন তারই গোপন ইতিহাস এই গানে ব্যক্ত হয়েছে। জীবন দেবতা কবিতায় তার এই একটি মাত্র কবিতাতেই কবি তাঁর জীবন দেবতাকে সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করেছেন। এখানে কবির ক্ষুদ্র ব্যক্তি জীবনকে অবলম্বন করে জীবন দেবতা যে বৃহত্তর সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে কিনা সেই জিজ্ঞাসা রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ কবির জীবনে জীবন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই। কিন্তু কবির সমস্ত কর্মের শুধু শ্রষ্টা নয়, স্রষ্টাও হয়ে উঠেছে এই জীবন দেবতা। ভাব- অনুভূতি- চিন্তার এক্যসূত্র এই জীবন দেবতার কাছে কবির জিজ্ঞাস্য জীবন দেবতা কী ক্ষুদ্র জীবনের অন্তর ও বাইরের সমস্ত পূজার অর্ঘ্য আনন্দে গ্রহণ করেছেন। কবির জীবন শত দুর্বলতায় ভরা— শত ব্যর্থতায় পূর্ণ, জীবন দেবতা কী সমস্ত দুর্বলতাকে আমল দেয় সার্থকতা দান করেছেন?

জীবন দেবতা মহাকবি, নব-নব সৃষ্টির কথা তিনি কবির জীবন বীণায় তিনি বাজিয়ে সুরের আলাপন করতে চান। কিন্তু কবি জীবন দেবতার সেই মহান পরিপূর্ণ বিশ্ব সঙ্গীত গাইবার অনুপযুক্ত বলে বলেছেন—

"যে সুরে বাঁধিলে এ বিশ্বের তার
নামিয়া-নামিয়া গেছে বারবার
হে কবি, তোমার বহিতে রাগিণী
আমি কি পারিব?"

আমি কি গাইতে

কবি মনে করেন তার মধ্যে যে শক্তি ছিল, যে সম্ভাবনা তার বিকাশ চরমে পৌঁছেছে তার থেকে বৃহত্তর, মহত্তর উৎকৃষ্ট তর কোন সৃষ্টি আর সম্ভব নয়। তাই এ জীবন শেষ করে নতুন জন্ম দিয়ে তাকে নবতম ও বৃহত্তর সৃষ্টির জন্য নিয়োজিত করবার জন্য জীবন দেবতার নিকট প্রার্থনা করে

"ভেঙে যাও তবে আজি মোর সাধের খাঁচা
আন নব বল আন নব শোভা
নূতন শক্তির লহ আবরণ চিরপুরাতন হোক ক্ষয়
নূতন জীবনে নূতনে ~~জাগাও~~ জাগাও নবীন জীবন জেগে

বস্তুত এই জীবন দেবতার অনুপ্রেরণায় কবি নব নব সৃষ্টি ও তার আস্বাদ। আর এই দেবতাই হৃদয়ের অন্তরে বসে তার মধ্য দিয়ে বিচিত্র রূপময় ও রসোজ্জ্বল সৃষ্টি লীলা প্রকাশ করে কবিকে বিস্মিত মুগ্ধ ও বিহ্বল করে দিয়েছেন।

Date- 24.09.09

২.১৬ "রবীন্দ্র কাব্য ধারায় মনুষ্যের প্রেম একটু স্বতন্ত্র ধরনের 'সরলা' কবিতায় তা আরও স্বতন্ত্র চিহ্নিত।" আলোচনা করো

প্রেমের অনুভূতি কবি হৃদয়ের স্বভাবজ হওয়ায় ~~চিত্ত~~ চিত্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতি ন

[illegible] সত্যিকারের দুঃখ [illegible] বলতে [illegible] ধরনে [illegible] পারেননি, তাই এর মানে [illegible] দুঃখ পাই তার [illegible] দুঃখ এর প্রকাশ [illegible] মহিমা [illegible] তাই বস্তুত এখানেই রবীন্দ্র প্রেম ভাবনার সাথে আলোচ্য কবিতাটির স্বতন্ত্রতা।

Q.১৪. "'প্রেমদিনে' কাব্য গ্রন্থের ১০২নং কবিতা 'প্রত্যুত্তর'-এ কবি বিহারীলালের অনুসরণ স্বীকার করেছেন।"
— আলোচনা কর।

রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমদিনে'-এর মুখ্য সংলাপ-কবিতা হল 'প্রত্যুত্তর'। সত্যেন্দ্রের মধ্যে প্রীতি ও মানব প্রীতি বিকাশ ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যেন্দ্র নাথ কেবল আকাশ বলে রোমান্টিক কবি নন। তিনি ইংরেজি গ্রন্থ ইমার্সন-এর সমান মুগ্ধ ছিলেন। আলোচ্য কবিতাটিতে প্রমাণ করে, কিন্তু আলোচ্য কবিতাতে জীবনের দুঃখ-কষ্ট কবি অবিচলিত সমাধানের কথা, আকাশ কথা কিন্তু নয়— অর্থাৎ তার কবিতাতে যে অনুসরণ হয়েছে এবং সেটা তিনি স্বীকার করেছেন।

কবিতা সম্পর্কে বলা হয়, কবিতা কেবল আনন্দ যোগায়, মানুষের হৃদয়ে সুরের রেশ টানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিতা সম্পর্কে একথা যতখানি সত্য, শেষ পর্যায়ের কবিতা সম্পর্কে ততখানি সত্য নয়। কেননা কবি বোধে এখন ~~[illegible]~~ যে

"অপমান বিঘ্ন ধরা অবলুপ্ত প্রায়
কালিমার দৈন্য আলোকেরে আবরে।"

জীবন সায়াহ্নে কবির বোধের সমান হয়ে উঠেছে সত্যকার মানুষের। সমালোচক লিখেছেন —

"মানুষ ও জীবন সম্পর্কে শেষ দিন পর্যন্ত কবির কৌতূহলের ও উৎকণ্ঠার কমতি নেই। পৃথিবীর সামগ্রিক এমনকি দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণাসুখ-দুঃখের সহিত

তুলি যে সাহস যে পরিশ্রম আধিকারী মানুষের
প্রতিটির মনের বিচিত্র বেদনার সুর তুলি এখানে
কবিকে অধিকতর লেখে ও অনাড়ম্বর আকর্ষণ
করেছে।"

এই পার্থক্যের মানুষের প্রতি সাধারণ রয়ন তার
নিবেদন 'আরোগ্য' নাম গ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতায়
তিনি লিখলেন —

"মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলিবার
দেখি সেথা দলে দলে রচে
বিপুল জনতা বলে
নামহীন নানা দেশে নানা কাজে
ওরা কত কাজ
মাঠে প্রান্তরে।"

আর ১৩ সংখ্যক কবিতায় তিনি লিখলেন —

"নিতি স্রোতে চলিয়াছে ফল
তাঁতি দাস তাঁত বোনে তেলি তেল দেয় তুলি
~~[illegible]~~ বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মের
তটিনীরে ঢেউ দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

দুঃখের মূল, রবিঠাকুর 'নটরাজ' শুধু দেখা বিশ্বের সমস্ত
জাতি ও সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। বয়স যত বেড়েছে ধনী
গরীব মানুষের প্রতি কবির অনুকম্পা তত বেড়েছে, এবং
সঙ্গে বেড়েছে সোনার তরী 'গুপ্তধন' — 'ওরা যা কুড়ায়
তেমনি কুড়ায় নামে তাহা হয়ে যায়।' — এবং এখন
বাসনা। মানুষ মর্ত্য প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতিও বড়ো
জীবনের কবির ~~[illegible]~~ নিকট ভাবনায় বিকশিত হয়েছে।
বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত তত্ত্বের সাথে আত্মীয়তা করতে চেয়ে
বলে এক সময় কবি গেয়েছিলেন —

"জল পেতেছি, চোখ মেলেছি
ধরার রূপ প্রাণ ঢেলেছি
তারপর সারা অস্তিত্বের মাঝে সন্ধ্যা
শিহরে এই প্রাণ আমার সারা।"

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্র কাব্য বিশ্ব ব্যাপি আকাশ ছুঁয়ে যাবার এক
মে জাদুকর তাঁহার অলোক্য মহিমায় জাগ্রত করতে
বলেছেন—

"একটি স্বর্ণ প্রভাতের স্রোতে
নাবিক যদি ভাসে পাল তুলে দিক হতে,
তাতে সবার সাথে আছে মোর এই মন্ত্র ঘোষা—
সঙ্গী যারা সবাকার, লাভ করি-আনন্দের ভেদ্য
গীত ভাষাটি আমি পাইনে এখনো
বিহ্বলের, সঙ্গীতের স্বাদ।"

কিন্তু সাহিত্যের তথা যে জন্মগ্রহণ করেছে বৃহৎ কালের
সঙ্গীত চিত্ত তার অনুভব করে পারেন নি— এবং তাঁর
অপূর্ণতা। আর মানুষের অন্তর আলোর যে 'ঊষাময়' রবিকর
মানুষ, যাদের কালের কাঁটা বাঁধ-বাঁধ, দাঁড়ি-দাঁড়িয়ে
পাঁজ আবদ্ধ নয় যে সর্বত্র কাঁপি, সকল লোকের প্রকল
মানুষের অন্তরতম যে তাই মানুষের পরিচয় পেতে হলে
সাধারণের অনুরোধ পরিচয় লাভ করে হয় বে
তাদের জন্যের জন্য সকল শ্রেষ্ঠ লোকের
মিলবার সুযোগ দিয়েছি। জাতি, তোলে, দাঁড়ির সঙ্গে
তাদের তাঁহাকে লাভ ঘটিল না। স্বভাবতই তাদের কাছে
এই ধরনের সুরের অপূর্ণতা রয়েছে। কবি এজন্য তাই
কালের আহ্বান করেন অর্থাৎ তাঁকে বহন করা প্রতিজ্ঞা
হয়েছেন—

"আমার কবিতা জানি আমি
গোলাপ ফুটাবে এ আশা নহে মোর সর্ব প্রথম
ফুলের জীবনের শরিক যে জন, কবি
ফলেও ফলায় যে আত্মীয়তা রয়েছে তাহার
সে কবির বাণী লাগি আজি পেতে আছি
সাহিত্যের আনন্দের ভোজ
যারে না পারিনা দিতে নিজ হাতে
তারে দিতে আমি আছি তারি দোঁহে।"

কবি-চিত্তকে লাভ করিয়াছেন এমন কবিতাকে
বিশেষের সাধনা তাঁহার দালের প্রকাশিত, কিন্তু শেষ
অবধি তাঁর কাব্য সর্ব সাধারণ তথা সকলের
সকলের এক হয়ে পারেন। এই দ্বাদশের জীবন যাতে